International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-II, September 2015, Page No. 35-41
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

‘নারী মুক্তি’র বিশ্লেষণে আশাপূর্ণা দেবীর ‘বকুলকথা’

কৌশিকোত্তম প্রামানিক
ছাত্র গবেষক, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরপ্রদেশ, ভারত

Abstract

Ashapoorna Devi was a prominent novelist in Bengali literature. Her first novel Prem o Proyojan was published in 1944. But she came into light in the sky of Bengali literature by writing her best trilogy Pratham Protisruti, Subornolata and bakulkatha. In the first novel of her trilogy Pratham Protisruti`,wherein she portrays a female protagonist character, called satyaboti who raises a lot of question of resentment, indignation and opprobrium against patriarchal society and its deprivation of women rights .She always feels the needs of women emancipation and strive for it throughout her life. Second novel Subornolata`s central figure subornolata ,being a domestic suppressed housewife of the traditional patriarchal society, wants the sky of emancipation as her mother satyaboti whole heartedly wanted in the first novel. The last work bakulkatha we find two main women characters Bakul and parul daughters of subarnalata, from the second novel observe a huge changing pattern of society in their life span. In this novel their observation through their descendants left a question of the connotation of the word ‘emancipation` that is highly required to elucidation. What exactly writer try to tell us in this novel?

বকুলকথা উপন্যাসটি আশাপূর্ণা দেবীর ট্রিলজী উপন্যাসের সর্বশেষতম ফসল। এর কাহিনী লেখিকা বকুলের লেখিকা অনামিকা দেবী রূপে ‘আধেক ভয়ে, আধেক ত্রাসে’ আত্মপ্রকাশের কাহিনি ও অনামিকা দেবীর দৃষ্টিতে দেখা তৎকালীন সমাজের এক বাস্তব চিত্র। আশাপূর্ণা দেবী তার ট্রিলজী উপন্যাস ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ (১৯৬৪) ‘সুবর্ণলতা’ (১৯৬৭) ও ‘বকুলকথা’ (১৯৭৪)-য় প্রধানত তিনটি যুগকে তুলে ধরেছেন। প্রথম উপন্যাসম ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের প্রেরণা ও তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে লেখিকা নিজেই লিখেছেন —

> “ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রশ্ন-মুখর মন তখনকার প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে প্রখর হয়ে উঠেছে। মনে হয়েছে মানুষে মানুষে এত পার্থক্য কেন? অবস্থার এমন অসাম্য কেন? এমন অনেক ‘কেন’ই আমায় পীড়িত করেছে। বেশী পীড়িত করেছে মেয়েদের আবস্থা। কেন তাদের সকল বিষয়ে এই অধিকারহীনতা? কেন তাঁদের জীবন কাটে অন্ধকারে?” (পৃ-২২ আমার সাহিত্য চিন্তা-আর এক আশাপূর্ণা)

আশাপূর্ণা দেবীর ট্রিলজী উপন্যাসের দ্বিতীয় উপন্যাস ‘সুবর্ণলতা’-য় মা সুবর্ণলতার যে লেখিকাসত্তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রুদ্ধ কক্ষে বাতায়নের অভাবে দমবন্ধ হয়েছিলো, ‘বকুলকথা’ উপন্যাসে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান বকুলের মধ্য দিয়ে তার পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ। অনামিকা দেবী সাহিত্যিক ছদ্মনামে সুবর্ণলতার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান বকুল পাঠক জনসমাজের কাছে সমাদৃত। কিন্তু অনামিকা দেবীর এই প্রতিষ্ঠা খুব সহজ পথে মসৃণ পথে আসেনি, এসেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বাধা-বিপত্তির জঞ্জালকে পায়ে ঠেলে, অনেক কন্টকাকীর্ণ পথ পেড়িয়ে এসে শেষপর্যন্ত এসেছেন প্রতিষ্ঠার শিখরদেশে। আশাপূর্ণা দেবীর নিজের ভাষায় —

> "আজকের বাংলাদেশের অজস্র বকুল পারুলদের পিছনে রয়েছে বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। তারা সংখ্যায় অজস্র ছিলো না, তারা অনেকের মধ্যে একজন। তারা একলা এগিয়েছে। এগিয়েছে খানা ডোবা ডিঙ্গিয়ে; পাথর ভেঙ্গে কাঁটাঝোপা উপড়ে।"

'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে মা সুবর্ণলতা তার দুই ছোট মেয়ে পারুল ও বকুলকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে মানুষ করতে চেয়েছিলো। কিন্তু বড় দুই ছেলে ভানু ও কানুর কাছে মেয়েদের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাকে হীনকর সাব্যস্থ করার প্রয়াস ও নারীর শিক্ষার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মানসিকতা, সুবর্ণলতাকে মানসিক ভাবে আঘাত করেছিলো। সর্বপরি বাবা প্রবোধের পুরুষতান্ত্রিক রক্ষণশীল হুঙ্কারে পারুলের ইস্কুলে যাওয়া হয়ে উঠেনি, বকুল যদিও ইস্কুলে যাবার ছাড়পত্র পেয়েছিলো তবু এক অপরাধবোধে সবসময় বাড়িতে অপরাধিনি রূপেই থাকতে হত তাকে। দেশ এগারো বছর বয়স থেকেই বকুল শুনে শুনে আসছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিধি নিষেধের বুলিকে —

> "ধাড়ি মেয়ে, তোমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবার এতো কী দরকার? ... ধিঙ্গী অবতার! এবাড়ি ওবাড়ি বেড়িয়ে বেড়ানো হচ্ছে? যাও না সংসারের কাজ করগে না। ... ছাতে ঘোরা হচ্ছিল? কেন? বড় হয়েছো, সে খেয়াল কবে হবে?" (পৃ-৪০ বকুলকথা, আশাপূর্ণা দেবী)

বকুল ভালোবেসেছিলো পাশের বাড়ির পরিমল বাবুর ছেলে সুনির্মলকে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ও পরিবারের কর্তাদের চোখরাঙানি, লোকনিন্দে ও লোকলজ্জার ভয়কে জয় করতে পারেনি বকুল। নির্মলের প্রতি বকুলের ভালোবাসাকে কখনোই তার গুরুজনেরা মানুষ্য সহজাত ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেনি, বিচার করেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অন্যায় শাসনের দ্বারা চালিত হয়ে, একরোখা দৃষ্টি নিয়ে। তাই বকুলের নির্মলের বাড়ি যাওয়া নিষিদ্ধ, বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ, সাহিত্য চর্চা করা নিষিদ্ধ, সাহিত্য অধিবেশনে লেকচার শুনতে যাওয়া নিষিদ্ধ। শেষপর্যন্ত নির্মল এবং বকুলের ভালোবাসা পরিনিতি পায়নি। পরিবারের সকলের উদাসীনতা এবং অবহেলায় আজীবন কুমারীই থেকে গেছে বকুল, সাহিত্য সাধনাকেই জীবনের অন্যতম লক্ষ্য মেনে জীবন সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে সে।

তবে নিজেকে একজন সাহিত্যিক রূপে আত্মপ্রকাশ করতে গিয়ে অনামিকা দেবী ওরফে বকুলকে বাইরের সমাজেই শুধু লড়াই করতে হয়নি, করতে হয়েছিলো পরিবারের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারী ও পুরুষের ভেদ-বিভেদ মনোভাব সম্পন্ন মানুষদের সঙ্গেও, যে ভেদ বিভেদের সীমারেখা টেনে দিয়েছে আবহমানকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সমাজকর্তারা। নারী শুধু তার রূপ সৌন্দর্যের দৌলতেই বিশ্বজয় করতে পারে, ব্যক্তিগত কোন গুন না থাকা সত্ত্বেও। গুন থাকুক আর না থাকুক একজন মেয়ে নারীত্বের দুনেই সকলকেই প্রভাবিত করতে পারে এই মনোভাব পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শিকড়ে মিথ হয়ে গেথে আছে, সে কারণেই বকুলের ছোড়দা স্বীকার করেছেন বকুলের কবিতা পত্রিকা সম্পাদক মন্ডলীতে মনোনীত হয়ে উঠেছে একমাত্র লিঙ্গভেদের জন্যেই, কাব্যগুণের জন্যে নয় —

> "মেয়ে বলেই তাই লেখা ছেপে দিয়েছে! ... শুনতে পাস না ইউনিভার্সিটিতে পর্যন্ত গোবরমাথা মেয়েগুলোকে কি রকম পাশ করিয়ে দিচ্ছে? ওই লেখা একটা বেটাছেলের নাম দিয়ে পাঠালে, দেখতে স্রেফ ওয়েষ্টপেপারে বাস্কেটে চলে গেছে। (পৃ-৯৫ বকুলকথা, আশাপূর্ণা দেবী)

একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক রূপে বকুলকে প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক সময় লেগেছে। পৌঢ়ত্ব বয়সে পৌঁছে গেছেন অনামিকা দেবী। নিজে অর্থ, যশ, খ্যাতির চরম শিখরে পৌঁচ্ছেও নিজেকে স্বাধীন ব্যক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করাতে পারেননি অনামিকা দেবী। বাবা প্রবোধচন্দ্র কর্তৃক প্রদ্দত্ত আবাল্য আশ্রিত রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের ঠিকানাটিকে পরিত্যাগ করতে পারেননি লোকলজ্জা ও আত্মনিন্দার ভয়ে —

> "কতো অসম্মানের ইতিহাস, কতো অমর্যাদার গ্লানি বহন করে আশ্রয়টা বজায় রেখেছি। এখনও রাখছি — এখনও স্থিরবিশ্বাস রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের ওই ইঁটের খাঁচাখানার মধ্যেই বুঝি আমার মর্যাদা, আমার সম্মান। ওর গন্ডি থেকে বেড়িয়ে এলেই লোকে আমার দিকে কৌতুহলের দৃষ্টিতে তাকাবে। ওই খাঁচাটার শিকলগুলোয় মরচে পড়ে গেছে, তবু তাই আঁকড়েই বসে আছি।" (পৃ-২৪২ বকুলকথা, আশাপূর্ণা দেবী)

উপন্যাসে লোকলজ্জা ও লোকনিন্দের ভয়ে ভীত বকুল পিতৃদত্ত পরিচয়ের বাইরে বেড়িয়ে আসতে চায়নি। অথচ বকুল নিজে আত্মপ্রতিষ্ঠিত, ইচ্ছা করলেই নিজস্ব পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত, কিন্তু বকুল তা করেনি অনামিকা দেবী নামে আত্মপ্রতিষ্ঠিত

হয়েও। যতদিন নারী কুমারী থাকে ততদিন পিতৃপরিচয়ের পরিচিত, বিয়ে হয়েগেলেই সে স্বামীপরিচয়ে পরিচিত বাধাধরা পুরুষতন্ত্রের এই গন্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে বকুল।

নিজে কুমারী থেকেও, সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেও নিজে যেমন সমাজের কাছে বিপন্নবোধ করেছে ঠিক তেমনি এই উপন্যাসের আর এক নারী চরিত্র সুবর্ণলতার সেজ মেয়ে বকুলের সহোদর পারুলবালাও ইস্কুলে শিক্ষা লাভ করতে পারেনি পারুল দাদাদের নারী শিক্ষার প্রতি বিদ্রূপাত্মক মনোভাব, বাবা প্রবোধের একান্ত অনিচ্ছাতে ও নারী শিক্ষা প্রতি পুরুষতান্ত্রের অন্যায় আদেশে। নিজেকে শিক্ষার অঙ্গন থেকে গুটিয়ে নিয়ে, শ্বাশতকালের পুরুষতান্ত্রিক বাধাধরা নিয়মের রজ্জুতে বন্দিনী নারীদের মত তাকেও অল্পবয়সেই বিয়ের পীড়িতে বসতে হয়েছে। এমনকি নিজের বিবাহিত জীবনেও পারুল তার কাব্যিক সত্তাকে বিকাশিত করতে পারেনি। সামাজিক বিবাহিত জীবনের স্বামী নামক সন্দেহবাতিক পুরুষের থেকে কাব্যিক প্রেরণার বদলে শুধুই পেয়েছে সন্দেহের তীর। উপন্যাসে একদিকে সুবর্ণলতার ছোট মেয়ে বকুল নিজেকে সাহিত্যিক রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিলো, অন্যদিকে পারুলের সমস্ত রামান্টিক কাব্যিক প্রতিভাকে স্বামী সন্দেহের য়ুপকাষ্ঠে বলি দিতে হয়েছিলো। স্বামী অমলবাবু কোনদিনই পারুলকে কবিতা লিখতে প্রেরণা দান করেননি বরঞ্চ পারুলের রোমান্টিক কাব্য লেখার প্রেরণার উৎসরূপে পরিকীয়া প্রেমের সন্দেহ ঘণীভুত হয়েছে তার মনের গভীরে। স্বামীর সমস্ত ভালোবাসার আতিশয্য পারুলের কাছে এক সন্দেহবাতিক স্বামীর বোঝাস্বরূপ মনে হয়েছে। যে ভালোবাসা স্বামী পারুলকে বিবাহকাল থেকে মৃত্যু অবধি ভালোবাসা প্রদান করেছে তার সবটাই পারুলের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত। প্রথাগত হিন্দুনারীর জীবন আদর্শ ছিলো পারুলের কাছে ফাপা, অন্তঃসারশূন্য। বকুলের প্রতি পারুলের উক্তি সে কথাকেই স্মরণ করায় —

> "কিছুতেই নিজেকে 'হিন্দুনারী'র খোলসে ঢুকিয়ে ফেলতে পারছি না, অথচ খোলসটা বয়েও মরছি। হয়তো মরণকাল অবধিই বয়ে মরবো।"

হিন্দু নারীর জীবনের পরম লক্ষ্যই হলো স্বামীর ভালোবাসার হৃদয়ে যথাযোগ্য স্থান করে নেওয়া। কিন্তু পারুল অন্যান্যদের থেকে আলাদা। তাই স্বামীর ভালোবাসা তার কাছে বিরক্তিকর মনে হয়েছে। হিন্দুনারীর পুরাতন বিধবা সমাজ ও সংস্কারকে মান্য না করার জন্য, বৈধব্যের আচার আচরণ পালন না করার জন্য, পাড়া প্রতিবেশীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছে ভৎসনা —

> "গঙ্গা বক্ষে বাস করেও মোহনের মা নিত্য তো দুরের কথা যোগাযোগেও গঙ্গাস্নান করেননা, পুজো করেন না, হিন্দু বিধবা-জনোচিত বহুবিধ আচারই মানেন না। এমন কি জানেনও না। বিধবাকে যে হরির শয়ন পড়ার পর পটল আর কলমি শাক খেতে নেই, একথা জানতেন না তিনি, তারকের মা সেটা উলেখ করায় হাসিমুখে বলেছিলেন 'তাই বুঝি?' কিন্তু হরির শয়নকালের সঙ্গে পটল-কলমির সম্পর্ক কি?" (পৃ-২৫ বকুলকথা, আশাপূর্ণা দেবী)

যুক্তিবাদী পারুল খুজে পায়না এই সব আচার-আচরণের সঙ্গে বাস্তবের কি সম্পর্ক। এমনকি এক স্বামী সোহাগিনী পতিব্রতা স্ত্রী রূপে পারুল সমাজ সংসারের নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না - 'লালপাড় শাড়ি বড্ড যেন প্রতিব্রতা পতিব্রতা' গন্ধ। পারুলের যেন মনে হয় 'মিথ্যা বিজ্ঞাপন গায়ে সেঁটে বেড়াচ্ছি।' তার স্বামীকে একজন আর পাচটা সাধারণ স্বামী রূপেই কাছে পেতে চায়। স্বামীর ভালোবাসার আতিশয্য থেকে পারুল মুক্তি চায়। তার কবি মন একজন হিন্দুনারীর পতিব্রাত্য ও সংসারের চিরাচরিত নিয়মবদ্ধ কর্মশৃঙ্খলের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে নারাজ। পারুল তার স্বামী অমলবাবুর কাছে এক গভীর আসক্তি। যে আসক্তি তার বাবা প্রবোধের ছিলো তার মা সুবর্ণলতার প্রতি। অমলবাবুর মৃত্যুই পারুলকে মুক্তি দিয়েছে, দিয়েছে কল্পনার খোলা আকাশ —

> "পারুলের বিধাতা পারুলের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রসন্না বৈকি, তাই পারুলকে দীর্ঘদিন ধরে একটা স্থুল পুরুষচিত্তের ক্লেদাক্ত আসক্তির স্বীকার হয়ে পড়ে থাকতে হয়নি, যে আসক্তি একটা চটচটে লালার মত আবিল করে রাখে, যে আসক্তি কোথাও কোনদিকে মুক্তির জানালা খুলতে দেয় না।" (পৃ-১৫২ বকুলকথা, আশাপূর্ণা দেবী)

পারুল নিজে পরকীয়া প্রেমের জন্যে বা স্বেচ্ছাচারী হওয়ার জন্যে স্বামীর অনাবশ্যক আবিলতা থেকে মুক্তি চায়নি। যে নারীমুক্তি, স্বাধীনতার জন্যে মা সুবর্ণলতা সমস্ত সমাজ সংসারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, সেই স্বাধীনতাকেই পারুল পেতে চেয়েছে স্বামীর কাছ থেকে। আধুনিকতা নামক প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেবার জন্যে নয়। আত্মিক স্বাধীনতার মধ্য দিয়েই পারুল অন্যান্য স্বাধীনতা কে পেতে চেয়েছে। মহাকালের রথের অগ্রগতিতে যখন মূল্যবোধের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, যখন সমাজ

গঠিত হচ্ছে তার চিরাচরিত কাঠামোকে ফেলে দিয়ে এক নতুন কাঠামো নয়ে, তারই একজন সাক্ষী রূপে বৃদ্ধা পারুল দেখেছে সমাজকে।

যুগের সাক্ষী রূপে যেমন পারুল ঠিক তেমনি তার সহোদরা বকুল ওরফে অনামিকা দেবী ও লক্ষ্য করেছেন যুগের পরিবর্তনকে। ভাইঝি শম্পা ও নাতনী সত্যভামার মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন নতুন যুগকে, যে যুগ তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। নতুন যুগের নারীস্বাধীনতায় লালিত এক নারী। প্রেমের অংকুরোদ্গম ও তার প্রকাশ মাত্র এগারো বছর বয়সেই। নিজের স্বাধীন ইচ্ছা-অনিচ্ছায় চালিত এক প্রাণবন্ত নারী। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শাসন ও নিয়ম বাধনের শৃঙ্খল শম্পার পায়ে বেড়ি পরাতে পারেনি। লাজুক বকুলের মত সে তার ভালোবাসাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পদতলে দলিত হতে দিতে নারাজ। কোন রক্তচক্ষুর চোখরাঙানিকে সে পরোয়া করেনি। বাড়ির প্রচলিত গন্ডীর সীমাকে অতিক্রম করে এক নতুন অনাসৃষ্টি কান্ড করার ক্ষমতা সে রেখেছে। একদা যে পরিবারে শম্পার পূর্বসুরী নারীরা চার দেওয়ালের মধ্যে কালাতিপাত করেছে, নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে দলিত করা হয়েছে, সেখান থেকে বেড়িয়ে এসে শম্পা নিজের ইচ্ছায় বাড়ির অনুমতিকে গ্রাহ্য না করে বিয়ে করেছে এক বিজাতীয় কুলি মজুর সত্যবান দাসকে। লোকনিন্দের ও লোকলজ্জার ভয়কে অবলীলায় সংগ্রামে জয়ী হবার মত সাহস রেখেছে সে। নিজের জীবনের ভালোবাসার কাছে মাথা নত করেছে সমাজকে সংসারের যাবতীয় নিয়মকে। নিজস্ব ব্যক্তিস্বাধীনতায় জয়ী করেছে ভালোবাসাকে। অনামিকা দেবীর যুগের সময়েও প্রেম ছিলো কিন্তু শম্পাদের যুগের মত সাহসী ও নির্ভীক নয়, তারই ফলশ্রুতিতে অনামিকা দেবীর ভালোবাসার অসার্থক পরিনতি।

শুধুমাত্র ভালোবাসার শক্তিতেই ঘর ছেড়েছে শম্পা, রক্ষণশীল পরিবারের একজন শিক্ষিতা মেয়ে হয়েও একজন কুলি মজুরকে নিয়ে বস্তিতে বসবাস করেছে শুধু ভালোবাসার গুণেই। কারখানার লক আউটের গন্ডগোলে সত্যবান দাসের বোমায় পা দুটোকে হারালেও শম্পা সত্যবানকে ত্যাগ করেনি। পিসি অনামিকা দেবীর নিজস্ব স্বীকারোক্তিতে 'ওরা গড়গড় করে চলে যেতে পারে', 'জল মানে না, আগন মানে না, কাঁটাবন মানে না গড়গড়িয়ে এগিয়ে যায়' এই বিশেষণে বিশেষিত হয়েছে শম্পা। শম্পাদের যুগের কাছে হেরে যেতে হয়েছে লেখিকা অনামিকা দেবীর যুগকে। অনামিকা দেবীর নিজস্ব স্বীকারোক্তিতে অনামিকা দেবীরা হেরে গেছে। অনামিকা দেবীকেও সেজন্যে স্বীকার করতে হয় —

> "তোমাদের কাছে আমরা হেরে গেছি। আমরা জীবনের সব থেকে ভয় করেছিলাম নিন্দের ভয়কে, তোমরা সেই জিনিসটাকেই জয় করেছো। তোমরা বুঝেছ ভালোবাসার চেয়ে বড়ো কিছু নেই, তোমরা জেনে নিয়েছো, নিজের জীবন নিজে আহরণ করে নিতে হয়, ওঠা কেউ কাউকে হাতে করে তুলে দেয় না। সেই জীবনকে আহরণ করে নিতে তোমরা তোমাদের রথকে গড়গড়িয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারো কাঁটাবনের উপর দিয়ে।" (পৃ-২৪৬ বকুলকথা, আশাপূর্ণা দেবী)

মা সুবর্ণলতার মৃত্যুতে অনামিকা দেবী ওরফে বকুলের শৈশব জীবন অতিবাহিত হয়েছিলো বড়দাদা ভানু ও বাবা প্রবোধ নামক পুরুষতান্ত্রিক কারারক্ষীর রক্তচক্ষুর শাসনে। আলিখিত শাস্ত্রের অলিখিত সমাজপতিদের নির্মিত নিয়ম শৃঙ্খলা ও বন্ধনের রজ্জুতেই। কিন্তু সমস্ত বন্ধন –শৃঙ্খল রজ্জুর বেড়ি ভেঙ্গে বকুল অনামিকা দেবী ছদ্মনামে সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বয়ং স্বনির্ভর হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তিনি লক্ষ্য করেছ সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং নারী স্বাধীনতার অপপ্রয়োগকে। নারী স্বাধীনতার উজ্জ্বল আলোকের জাজ্বল্যমান চিত্রের বিপরীতে নারী স্বেচ্ছাচারীতার এক ভয়ঙ্কর পরিণামকে, যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে সমগ্র সমাজকে। অথচ এই নারীস্বাধীনতাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে তার দিদিমার মত অসংখ্য সত্যবতীকে ঘর ছাড়তে হয়েছে অসংখ্য সুবর্ণলতাকে শাশুড়ি মুক্তকেশীর সংসারের সংসারে আজীবন সংগ্রাম করতে হয়েছে। আজকের সমাজের প্রেক্ষিতে মূল্যহীন হয়ে যেতে চলেছে সমাজের অতীব মূল্যবান বস্তুও। যুগের রথের চাকা যতই এগিয়ে চলেছে ততই মূল্য সম্পর্কে মানুষের ধ্যানধারণা বদলে যাচ্ছে। সম্পর্কের পরিণতি বদলে যাচ্ছে, সম্পর্কের সংজ্ঞার ধারণা বদলে যাচ্ছে, এসকলই এই উপন্যাসের উপজীব্য।

উপন্যাসে একদিকে যেমন লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী দেখিয়াছেন ব্যক্তিস্বাধীনতার সুপ্রভাব তেমনি অন্যদিকে স্বাধীনতাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে জীবন নিয়ে ছেলে খেলা করার ধ্বংসাত্মক পরিণতিকেও তিনি দেখিয়েছেন। বিশ্বায়নে যতই পৃথিবীর বয়স বড়াছে, ততই ভোগ্যবস্তুর প্রতি মানুষের চাহিদা নিত্য বেড়েই চলেছে। 'স্বাধীনতা' নামক শব্দের অন্য ব্যাখ্যা খুঁজছে অনামিকা দেবীর ভ্রাতস্পুত্রের বৌ অলকা এবং তার মেয়ে সত্যভামা। অলকা মেয়েকে আধুনিকতার উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত করে একজন সর্ববিশারদ করে 'নাচনি মেয়েতে' পরিণত করতে চেয়েছেন। যে পরিবারের নারীরা ছিলো চার

দেওয়ালের মধ্যে বন্দী সেই ঘরের মেয়েরাই সেই চার দেওয়ালের ভাঙ্গন শুরু করেছে। একদিকে এই ভাঙ্গন যেমন এনে দিয়েছে পরিবারের মান-সম্মান, বৈভব, ঘশ ও প্রাচুর্য্য অন্যদিকে তেমনি এনেছে এক মারাত্মক বিপর্যয়। হঠাৎ স্বাধীনতার আলোর রোশনাইয়ে দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছে অলকা ও সত্যভামা। আধুনিকতার জ্বাজল্যমান জৌলুসের আলোয় আলোকিত হয়ে সত্যভামার 'ক্যাবারের' নাচনিতে পরিণতি ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন, নিজেকে একজন বহুভোগ্যার উপযোগী করে তৈরী করার প্রচেষ্টা, মূলত মূল্যবোধের যুগ পরিবর্তন। এককালীন সমাজে, ও সময়ের প্রেক্ষিতে যা ছিলো চূড়ান্ত নিষিদ্ধ তাই আজ সমাজ ও সভ্যতার বদান্যতায় হয়েছে সুরভিত, গৌরবের বিষয়। 'সভ্যতা' 'শালীনতা' ও 'রুচি' বোধের দেখা দিয়েছে বিপর্যয় —

> "ব্লাউজের গলার এবং পিঠের কাট এতো নামিয়ে ব্লাউজের গায়ের সঙ্গে আটকে রেখেছে কি করে সত্যভামা? নাভির এতো নীচে শাড়ীটাকে পরেছে কি করে? ওই নখগুলো এতো লম্বা হল কি করে? ও কি নিজেই বুঝে ফেলেছে ওর ওই দেহখানা ছাড়া আর কোন সম্বল নেই, নেই কোন সম্পদ? তাই ওই দেহটাকেই-কি অশ্লীল! কি অরুচিকর!" (পৃ-২৮৩ বকুলকথা, আশাপূর্ণা দেবী)

'স্বাধীনতা' শব্দের সঠিক সংজ্ঞা বুঝতে না পেরে, তাকে উপযুক্ততায় পর্যবেশিত করতে না পেরে তার অপব্যবহার করেছে অলকা এবং সত্যভামা। যার মূল্য দিতে হয়েছিলো সত্যভামাকে তার ঘৃণাত্মক মৃত্যু দিয়ে, এবং অলকাকে তার সন্তানের অকাল মৃত্যু দিয়ে।

আধুনিক সভ্যতার করালগ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি গৃহস্থ আটোপৌড়ে ঘরের গৃহবধু নমিতাও। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে গিয়ে নমিতাও দিক্‌ভ্রষ্ট হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সাহিত্য সভায় গিয়ে লেখিকা অনামিকা দেবী, সাহিত্যসভার সভাপতি অনিলবাবুর বাড়ীতে সেবাসুত্রে ভাগ্নেবৌ নমিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। নমিতা উদাসীন স্বামীর এক পরিত্যক্তা, ভাগ্যবিড়ম্বিত স্ত্রী। স্বামী সন্যাসী হয়ে হৃষিকেশে পাড়ি দিয়েছেন। গতান্তর না দেখে নমিতাকে তার মামা শ্বশুড় অনিলবাবুর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। নিজে একজন সধবা নারী হয়েও তাকে একজন বিধবার মত দিন যাপন করতে হয়। মামা শ্বশুড়ের বাড়িতে নিজেকে দাসী রূপে সংসারে নিমগ্ন হয়ে স্বামীর বিরহ ব্যথা ভুলে থাকতে চায় সে। কিন্তু পারে না, তাই একদিন সে সমস্ত সংসার ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে সে। তার সতী সাধধী স্ত্রীর জীবন ছেড়ে একদিন নিজেকে যাচাই করার জন্যে সে কলকাতায় বাপের বাড়ীতে এসেছে। তার চেতনায় মামা শ্বশুড়ের বাড়িতে স্বামীহীন পড়ে থাকে, একজন লক্ষী বৌ এর ভূমিকায় হওয়া, নিজের কুপমুন্ডকতার শামিল। সমস্ত দেহ-চেতনা প্রচলিত সতী প্রথার বিরুদ্ধে বিরোধিতা করেছে। নমিতার নিজস্ব স্বীকারোক্তি অনামিকা দেবীর কাছে —

> 'কিছু না কিছু না। আপনি জানেন না, এতোদিনের সেবার পুরস্কারে একটুকু ভালোবাসা পায়নি। শুধু স্বার্থ, তার জন্যেই একটু বুলি। বলুন যেখানে একটুখানি ভালোবাসা নেই, সেখানে মানুষ চিরকাল থাকতে পারে?'

স্বামীর মত নিজেও সন্যাসী হতে চেয়েছিলো সে, স্বামীহীন সংসারের সেবা তার কাছে মনে হয়েছিলো জীবনের অর্থহীন অপচয়। কিন্তু নমিতা সন্ন্যাসী হতে পারেনি। পরিবর্তে সে আধুনিকতার ঝলমলে আলোর রোশনাইয়ে, খানিকটা জীবনের প্রতি প্রতিশোধে নিজেকে 'মধুছন্দা' নামক অভিনেত্রীতে পরিণত করেছিলো, মান-সম্ভ্রম ও পারিবারিক সম্মানকে জলাঞ্জলি দিয়ে একজন আধুনিক চলচিত্র অভিনেত্রীর জীবন-যাপনকে বেছে নিয়েছিলো।

লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে ঘর ত্যাগ করা বধু চরিত্র আমরা তার অনেক উপন্যাসেই পাই। তার প্রথম উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজন' উপন্যাসে-এ যেমন আরতি নামক নারী চরিত্রটির সাক্ষাৎ পেয়েছি, যে কিনা স্বামী নিখিলেশের সাংসারিক বৈরাগ্য ও সমস্ত রকম উদাসীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শেষপর্যন্ত নতুন এক জীবন সঙ্গীকে নিয়ে নতুন সংসারে সাফল্য লাভ করেছিলো। এই উপন্যাসে কিন্তু নমিতা সাফল্য করতে পারেনি। বিলাসব্যাহুল জীবন ও যথেচ্ছাচারের সুযোগে নিজেকে নষ্ট করেছিলো সে। আধুনিকতার ভালো-মন্দকে সে বুঝে উঠতে পারেনি। উপন্যাসে শেষে তার আত্মহতার করুণ পরিণতি আধুনিকতার এক ধ্বংসাত্মক দিক।

কালের বিবর্তন উপন্যাসটির প্রধান উপজীব্য বিষয়। কালের অমোঘ পরিবর্তনের জন্যেই নির্মলের তেরো বছরের নাতি বুর্জোসমাজের পতনের আশায় বোমা বানাতে গিয়ে নিজের হাত পা উড়িয়ে দিয়েছে, বিশিষ্ঠ লেখিকা অনামিকা দেবীর জ্যঠতুতো দাদার নাতনী দর্জিপাড়ার রক্ষণশীল পরিবারের জাল কেটে, একদল ছেলের সঙ্গে সাইকেলে 'বিশ্বভ্রমনে' পাড়ি দিয়েছে, রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হয়েও। পারুলবালার ছোটছেলে শোভনের বৌ রেখার ও তাদের রূচির অমিলতায় বিবাহ

জীবনের ছন্দপতন, বিবাহবিচ্ছেদ, বিত্তের পরিবাশ থেকে রেখার দারিদ্র পরিবেশে নিজেকে খাঁপ খাওয়ানো, এসব উগ্র ব্যক্তিস্বাধীনতাকেই দর্শিত করে।

উগ্র স্বাধীনতা সমাজে বয়ে আনে ধ্বংসের বীজ। অনাগত ও আগত সুকুমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অনিশ্চতায়, উগ্রব্যক্তি স্বাধীনতার ফসল। উপন্যাসে রেখা ও শোভনের ছেলে মেয়েদের গিলতে হয়েছে উগ্রস্বাধীনতার বিষময় ফলকে। শোভনের ছেলে রাজার শৈশবেই বাড়ি ছেড়ে বোর্ডিং-এ স্থানান্তকরণ এক ভয়াবহ সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় যেখানে স্নেহময় সামাজিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে ভরে উঠবে তিক্ততায়, বেদনায় জর্জরিত হয়ে। পারুলের ডায়েরী থেকে —

> "সেই বালগোপালের মত কোমল সুকুমার মুখে কী অদ্ভুত কাঠিন্যের ছাপ। এরপর থেকে হয়তো এই একটা জাতি সৃষ্টি হবে, যারা মা বাবাকে অস্বীকার করবে, বংশপরিচয়কে অস্বীকার করবে, হৃদয়বৃত্তিকে অস্বীকার করবে। কঠিন মুখ নিয়ে নিজেদেরকে তৈরী করবে, পৃথিবীর মাটিতে চড়ে বেড়াবার উপযুক্ত ক্ষমতা আরহণ করে। আর সে ক্ষমতা অর্জন করতে পারলে বাপকে বলবে, 'আমার লেখাপড়া শেখাতে যা খরচ হয়েছে তা শোধ করে দেব।' ... অথবা বলবে 'যা করছো, করতে বাধ্য হয়েই করেছো।' পৃথিবীতে এনেছিলে কেন আমাদের? তার একটা দায়িত্ব নেই?" (পৃ-৩২৮ বকুলকথা, আশাপূর্ণা দেবী)

উগ্র স্বাধীনতার দড়ি-টানাটানির যুদ্ধে বলি হতে চলেছে সামাজিক নিয়ম, শৃঙ্খলা ও 'বিবাহ' নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেকটি সভ্যজাতি উগ্র স্বাধীনতার আলোয় আলোকিত হয়ে এক গভীর শূন্যতার অন্ধকারের আগমনকে সুচিত করেছে। সুকুমার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আজ বিপন্ন। পারুলের প্রশ্নের মাধ্যমে লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী ব্যক্ত করেছেন —

> 'এ যুগ কি ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর মেয়েদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে এদেশেও সেই একটা হতভাগ্য জাতি সৃষ্টি করলো, পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতিরা যা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছে। যে হতভাগ্যেরা শিশুকালে বাল্যকালে তাদের জীবনের পরম আশ্রয় হারিয়ে বসে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায় কঠিন হয়ে উঠবে, উচ্ছৃঙ্খল হবে, স্বেচ্ছাচারী হবে, সমাজদ্রোহী হবে অথবা একটা হীনম্মন্যতায় ভুগে ভুগে জীবনের আনন্দ হারাবে, উৎসাহ হারাবে, বিশ্বাস হারাবে।' (পৃ-২৭৯ বকুলকথা, আশাপূর্ণা দেবী)

লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা' ট্রিলজী উপন্যাসে বকুলের দিদিমা সত্যবতী, স্বামী নবকুমারের ঘর ছেড়েছিলো 'বিয়ে ভাঙ্গা যায় না কেন' এই প্রশ্ন নিয়ে। সত্যবতী যে নারীস্বাধীনতার দাবী নিয়ে ঘর ছেড়েছিলো, যে স্বাধীনতার জন্য সত্যবতী আমরণ সংগ্রাম চালিয়েছিলো তা মূলত সমাজ সংসারের জন্য এক কল্যাণময় দিক, কিন্তু আজকের সমাজে স্বাধীনতার অপব্যবহার ও তার ভ্রান্ত ধারণা সমাজের পক্ষে এক ভয়াবহ বিপদের সূচনা করেছে, পারুলের কণ্ঠেই লেখিকা উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন —

> "কিন্তু এটাই কি চেয়েছিলাম আরমা? আমি তুমি, আমাদের মা দিদিমা, দেশের অসংখ্য বন্দিনী মেয়ে? এটাই কি স্বাধীনতার রূপ? যে স্বাধীনতার জন্যে একদা পরাধীন মেয়েরা মাথা কুটেছে, নিরুচ্চার আর্তনাদে বিধাতাকে অভিসম্পাত করেছে? এ কি সেই মুক্তির আলো, যে মুক্তির আশায় লোহার কারাগারে শৃঙ্খলিতা মেয়েরা তপস্যা করেছে, প্রতিক্ষা করেছে? ... না বকুল, আমরা চাইনি।" (পৃ-৩৫৫ বকুলকথা, আশাপূর্ণা দেবী)

এই ট্রীলজী উপন্যাসে সত্যবতী, সুবর্ণলতা, বকুল, পারুলেরা যে স্বাধীনতাকে সর্বক্ষন অন্বেষণ করেছে, লেখিকার তা কখনোই 'উচ্ছৃঙ্খলতাই মুক্তির রূপ' নয়, 'অসভ্যতাটা সভ্যতার চরম সীমা' নয়, 'সবকিছু ভাঙাই হচ্ছে প্রগতি' নয়। তাঁর মূল বক্তব্য মূল ধরা দিয়েছে তারই নিজের ভাষায় —

> 'প্রথম জীবনে মেয়েদের অবরেওধ সমস্যাই আমাকে সবচেয়ে বেশী পীড়িত করত। ছেলেবেলা থেকেই তো দেখছি সেই বন্ধনদশাগ্রস্থ অবস্থা। তাছাড়া মেয়েদের সব বিষয়েই ছিলো অনধিকার। এখন সেই অবস্থা অনেক কেটেছে। অন্তত আইনের দিক থেকে সমস্ত বিষয়ের অধিকার তারা পেয়েছে। স্বাধীনতা-সেটাও বাইরের জগতের যা পাবার তা পেয়েছে। কাজেই এখন আর সেই নিয়ে মনকে পীড়িত করে না। এখন যা আমাকে ভাবায় তা হল মেয়েদের স্বাধীনতা পাবার পর তার সদ্ব্যবহার হচ্ছে কি না? মনের মধ্যে স্বাধীনতা নামক যে স্বপ্নের জগৎ ছিলো ঠিক তেমনি কি হচ্ছে। ... বললে ভুল হবে না-বড় অসহিষ্ণু হয়ে গেছে আজকের মেয়েরা। পরমত-অসহিষ্ণুতা তাদের জীবনে অশান্তি ডেকে আনছে।' (পৃ-১৯ যা দেখি তাই লিখি, আর এক আশাপূর্ণা, আশাপূর্ণা দেবী)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। দেবী, আশাপূর্ণা, আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা: প্রথম মাঘ ১৪০১ মুদ্রিত।
২। প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা : প্রকাশ মাঘ ১৩৭১ মুদ্রিত।
৩। বকুলকথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা : প্রকাশ মাঘ ১৩৮০ মুদ্রিত।
৪। সুবর্ণলতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা : প্রকাশ মাঘ ১৩৭৩ মুদ্রিত।
৫। গুহ, সুশান্তকুমার, সম্পাদনা, আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী, খন্ড ৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা : প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৪০৮ মুদ্রিত।
৬। মুখোপাধ্যায়, অসিত, বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, মর্ডাণ বুক এজেন্সি, কলকাতা: ১৯৯৮ মুদ্রিত।